আলোক
পুলক
শিহরণ
আল মাহমুদ

আলোক পুলক শিহরণ

আল মাহমুদ

প্রকাশকাল একুশে বইমেলা-২০০৯ গ্রন্থস্বত্ব লেখক প্রচ্ছদ ধ্রুব এষ
প্রকাশক আবুল কাসেম হায়দার, লেখালেখি, ইয়ূথ টাওয়ার ৮২২/২ রোকেয়া সরণী
ঢাকা-১২১৬ মুদ্রণ : লিপি কম্পিউটার্স ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
মূল্য : ৮০.০০ টাকা

Aulok Pulok Shihoran by Al Mahmud Published by Abul Quasem Haider, Lekhalekhi, Youth Tower, 822/2 Rokeya Sarani Dhaka-1216 Design Dhrubo Esh Price Tk. 80.00 US$ 3.00
ISBN : 9847050009550

উ ৎ স র্গ

আমার মা'কে

"তুমি আমাকে বলেছো তুমি এই ঢাকার শহরেই আছো এবং নিরাপত্তার মধ্যেই অবস্থান করছো। কিন্তু এই মুহূর্তে তুমি ঠিকানা দিতে চাও না। আমাকে খুঁজে বের করতে বলেছো তোমার ঠিকানা। যদিও আমার কোনো গরজ নেই, তবুও আমি তোমাকে খুঁজে বের করার বাসনা রাখি। আমি তোমার সব বান্ধবীকে তো চিনি। আজই একজনের কাছে গিয়ে হাজির হলে সে কিছু হদিস তো অবশ্যই আমাকে দিতে পারবে। আমি তোমাকে বলেছি প্রকৃতপক্ষে তোমাকে খুঁজে বের করার গরজ নেই। কথাটা একদিকে যেমন ঠিক তেমনি কিছুটা অপমানজনক বটে। বিশ্বাস করো আমি তোমাকে অপমান করতে ইচ্ছুক নই। তবে সবচেয়ে ভালো হয় তুমি নিজেই এই রহস্যময়তা ছেড়ে আমার কাছে এসে হাজির হও"।

আমি টেলিফোন নামিয়ে রেখে একাকী হাসতে লাগলাম। কিন্তু আমি যাদের ঘরে বসবাস করি তাদের একজন গৃহিণীর মতো মহিলা এগিয়ে এসে বললো– একাকী হাসছেন?

আমি মুখ ফিরিয়ে বললাম– আমার একজন প্রিয় মানুষ এই শহরে লুকিয়ে আছে। লুকিয়ে আছে বলাটা ঠিক নয়, বলবো আত্মগোপন করে আছে। লুকোচুরি খেলছে। আমি তাকে খুঁজে বের করতে চাই।

মহিলা হেসে বললো– যে ইচ্ছে করে লুকিয়ে থাকে তাকে কি পাওয়া যায়?

আমি বললাম– তুমি একটু সাহায্য করলেই আমি তাকে ঠিক বের করে ফেলবো।

মেয়েটি হাসলো। আমি কী সাহায্য করতে পারি? আমি তো কোনো লুকানো মানুষের পাত্তা খোঁজার দায়িত্ব নিইনি। কেনই বা নেব। আপনাকে আমার দেখাশোনা করার একটা কাজ চাপানো হয়েছে। বলা হয়েছে আপনি একজন কবি। আমি এতে রাজি হয়েছি। এমনিতেই রাজি হইনি, পয়সার বিনিময়ে রাজি হয়েছি। এখন আপনার নাওয়া-খাওয়ার সময় হয়েছে, ঠিক সাড়ে বারোটা বাজে, আপনি উঠে যান– এর মধ্যে কোনো টেলিফোন এলে আমি আপনাকে জানাবো। মেয়েটির কথাবার্তা বেশ গোছানো মনে হয়। আমি বললাম– কিছু না মনে করলে তোমার নাম জিজ্ঞেস করতে চাই। কী নাম তোমার?

মেয়েটি হেসে বললো– আমার নাম সুগন্ধি। আমি বললাম– বাহ্, চমৎকার নাম তো! মেয়েটি বললো– আপনি তো প্রশংসা করলেন, কিন্তু বান্ধবীরা বলে– এমন হাস্যকর নাম তোর কে রেখেছে? তোর গায়ে তো শুধু কুগন্ধ! এখন থেকে আতর মাখিয়ে চলবি। না হলে তোর গা থেকে গন্ধ বেরোবে।

আমি হাসলাম। বললাম– তোমাকে নিয়ে যে যতই ঠাট্টা করুক আমি একজন কবি। আমি কিন্তু তোমাকে খুব ছিমছাম আকর্ষণীয় সুন্দরী যুবতী বলেই প্রত্যক্ষ করছি। বেশ সুন্দরী মেয়ে তুমি। যারা তোমার ব্যাপারে উল্টাপাল্টা কথা বলে তারা ঈর্ষাকাতর।

সহসা কী মনে হতেই আমি অকস্মাৎ বলে ফেললাম, সত্যিই তুমি খুব সুন্দরী মেয়ে।

আমার কথায় সুগন্ধি থতমত খেয়ে এবং অনেকটা বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সোফায় বসে পড়লো। এবং দু'টি ডাগর চোখ মেলে আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো।

–বিশ্বাস হয় না!

–আপনি কবি, আপনার কথায় অবিশ্বাসের তো কোনো প্রশ্ন আসে না। কিন্তু আমি ভাবছি আমি কি সত্যিই তা-ই! তাহলে আমাকে তো কেউ পেতে চায় না। নিতে চায় না।

আমি হাসলাম।

–এটা তোমার ধারণা। সবাই তোমাকে ভালোবাসে। তুমি সুন্দরী বলেই ভালোবাসে। তাছাড়া তোমার চালচলন-কথাবার্তা আমার তো মনে হয় খুবই মিষ্টি। আসলে তুমি তো ধনী। যার রূপ আছে সেই ধনবান।

আমার কথায় মেয়েটি একেবারে মুগ্ধ হয়ে দৃষ্টি নামিয়ে ফেললো। ফিসফিস

করে বললো– হায় আল্লাহ! আপনার মতো কবি আমার এত প্রশংসা করলেন– মনে হচ্ছে ঠাট্টা করলেন।

–আমি ঠাট্টা করি না। তোমার যা প্রাপ্য সেটা শুধু তোমাকে শুনিয়ে দিলাম। আমার কথায় সুগন্ধি টুপ করে আমার পায়ে কদমবুচি করলো।

–এসব কী করছো।

সুগন্ধি কোনো কথা বললো না।

আমি খানিকটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গেলাম। আমার অবশ্য কোনো দায়দায়িত্ব নেই। একটি মেয়েকে খুঁজে বের করতে হবে। মেয়েটি কেমন ঠিক এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। কিন্তু তার বান্ধবীদের চিনি। লুকানো তার স্বভাব। আমি সুগন্ধির দিকে ফিরে বললাম,

–আমার দেখাশোনার ভার তোমাকে যারা দিয়েছে তাদের ব্যাপারে আমার কোনো কিছু বলার নেই। কিন্তু ইচ্ছা করলে এই দায়দায়িত্ব থেকে তুমি সরে দাঁড়াতে পারো। আমার কিছু বলার থাকবে না। আর আমারও এখানে সময় কাটালে চলবে না। আমি আজই রাস্তায় নেমে পড়বো। যে লুকিয়ে আছে তার নামধাম-ঠিকানা কী করে পেতে পারি সেটা একটু দেখতে হবে। আমার কাছে একটা পুরনো ডাইরি আছে সেই ডাইরিতে কাশিদা বলে একটা মেয়ের নাম আছে। টেলিফোন নম্বরও আছে– কিন্তু ওই নম্বরে টেলিফোন কেউ ধরে না।

শোনো সুগন্ধি, তুমি আমার জন্য বিশেষ কোনো তদারকির চিন্তা কোরো না। আপাতত আমি তোমার সাথে এই গৃহে বাস করলেও আমাকে ওই কাশিদার কাছে যে করেই হোক পৌঁছতে হবে। আমার প্রতি তোমার যে দায়দায়িত্ব পড়েছে সেটার জন্য ভাবতে হবে না। আমি নিজে জানি এটা আমার আশ্রয়। কিন্তু আমার প্রধান কাজ হলো মরীচিকার পেছনে ছোটা। যা হোক আমি বেরিয়ে পড়বো, তবে রাতে এখানে এসে চুপচাপ মাথা গুঁজে শুয়ে পড়বো। তুমি কোনো বিরক্তিবোধ কোরো না। আমার দ্বারা তোমার কোনো ক্ষতি হবে না।

আমার কথায় দেখলাম সুগন্ধি খুব বেশি খুশি হলো না। মাথা নুইয়ে বসে থাকলো।

আমি তাকে বিরক্ত না করার জন্য বেরিয়ে পড়বো বলে স্থির করলাম। হঠাৎ সুগন্ধি মাথা তুলে বললো,

–আপনার কাজে আমি কি আপনাকে সাহায্য করতে পারি না!

আমি চমকে গেলাম।

– বলো, কী সাহায্য করবে!

–এই তো ধরুন, আপনার সাথে আমিও যদি বেরিয়ে যাই, আমাকে কি সাথে নেবেন?

আচমকা এই প্রস্তাবে আমি থতমত খেয়ে গেলাম।

–তুমি যাবে আমার সাথে!

–যদি আপনার অস্বস্তি না হয়।

–অস্বস্তি হবে কেন? বরং একটা অসাধারণ সাহায্যের প্রস্তাব তুমি দিয়েছো। আমি বরং ভেবে পাচ্ছি না তোমার সাহায্যটা নেব কি না। অথচ আমি যে কাজটা করতে চাচ্ছি– যদি আমার সাথে কোনো মহিলা থাকে তাহলে দারুণ কাজ হবে।

–তাহলে আমি আপনার সাথে যাবো।

হেসে ফেললো সুগন্ধি। আমারও মনটা অনেক অনিশ্চয়তা থেকে রেহাই পেল। আমরা কথাবার্তা শেষ করে সুগন্ধির তৈরি চায়ে চুমুক দিচ্ছিলাম। এ সময় সহসা বেজে উঠলো টেলিফোন।

টেলিফোন তুলে হ্যালো বলতেই ওপার থেকে হাসির শব্দ পেলাম।

–কেন আমাকে খুঁজছেন, বলেন তো! আমি তো দেখতে অতো ভালো নই। আপনার পাশে বরং যিনি আছেন তিনি অনেক সুন্দরী। শিক্ষিতাও। অথচ আপনি কেন যে আমাকেই খুঁজে বের করতে চান– এটা আপনিই জানেন। আমি তো লুকিয়ে আছি প্রাণের ভয়ে। একটা লোক একদা যে আমাকে ভালোবাসার মিথ্যা ছলনা করতো, সে এখন ব্যর্থ হয়ে আমাকে মেরে ফেলতে চায়। অনেক দুর্নাম আমার রটিয়েছে– কিন্তু এতে কোনো কাজ হয়নি। হত্যাই তার শেষ সিদ্ধান্ত। আমিও তেমন নিরীহ নারী নই। হিংস্র-বাঘিনীও বলতে পারেন। এই দ্বন্দ্বে লড়াইয়ে আমি আপনাকে টেনে আনতে চাইনি। আপনি আপনা থেকেই এসে পড়েছেন। এখন পরিণাম কী হবে তা জানি না। কিন্তু কেউ আর ফিরে যেতে পারবো না। এই লড়াইয়ে কোনো পক্ষ হাত গুটিয়ে থাকবে না, তবে আপনার এত আগ্রহ কেন আমাকে দেখার!

– আগ্রহ নয় কৌতূহল। তোমার কণ্ঠস্বর মায়াবিনী। এক ডাকে আমি অভিভূত। আরো কৌতূহল এই জন্য যে তুমি রহস্যময়ী।

আমার কথার সাথে বেজে উঠলো খিলখিল হাসির শব্দ।

–আমার গলা শুনেই এত হয়রান। দেখলে আবার পাগল হয়ে যাবেন না তো!

আমি কোনো জবাব না দিয়ে হাসলাম। তারপর ওপাশ থেকে টেলিফোনটা রেখে দেয়ার শব্দ পেলাম। সুগন্ধি এর মধ্যেই এই কথোপকথন শুনে কেমন যেন ভয়চকিত হয়ে গেছে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে বললাম–

–এই হলো সেই মায়া-মরীচিকা। তুমি কি ভয় পেয়েছো!

সুগন্ধি মাথা নুইয়ে ফেললো।

আমি সুগন্ধিকে নিয়ে পরের দিন সকালে রাস্তায় এসে নামলাম। সুগন্ধি জানালো রিকশায় বা স্কুটারে সে যাবে না। হয় ফুটপাথ ধরে কিংবা তার জন্য ট্যাক্সির ব্যবস্থা করতে হবে। তবে সে অকপটে বললো সে হাঁটতেই বেশি ভালোবাসে। আমারও হাঁটার বাতিক আছে। রাস্তায় বেরিয়ে আমি বললাম,

–আমার ডাইরিতে একটা ঠিকানা আছে। এটা হলো ওই কাশিদা নামক মেয়েটির এক বান্ধবীর ঠিকানা। ভাবছি সেখানে গিয়ে হাজির হবো কি না। আর হাজির হলে তার বান্ধবী আমাদের কিভাবে নেবে! সুগন্ধি অবশ্য মুখের ওপর বলে দিলো,

–কে কিভাবে নেবে সেটা আমাদের দেখার বিষয় নয়। আমরা খুঁজছি এক রহস্যময়ীকে। এ অবস্থায় কে বিরক্ত হবে, কে কৌতূহলী হবে– কথা না বাড়িয়ে আমার সাথে হাঁটুন। হাঁটতে হাঁটতেই এই শহরের সব দরজা আমরা খুলে ফেলবো।

আমি সুগন্ধির কথায় একটু ভরসা পেলাম। সুগন্ধির হাসিটি ভারি সুন্দর। আমি মৃদু শব্দে বললাম,

–সুগন্ধি! তুমি তো বেশ সাহসী মেয়ে, না জেনে না শুনে আমার মতো এক অচেনা মানুষের সাথে বেরিয়ে পড়েছো।

–কে বলেছে আপনি অচেনা! আমি তো ছাত্রী অবস্থা থেকে আপনার কবিতা পড়েছি। আর এখন আপনার সাথে হাঁটছি।

–আমি ভেবেছিলাম আপনি খুবই বয়স্ক লোক। কিন্তু এখন তো দেখছি কবির মতোই চির তরুণ।

আমি হেসে ফেললাম।

–আচ্ছা সুগন্ধি, তুমি কোনো দিন কাউকে কি ভালোবেসেছো!

–সত্য কথা বলবো?

আমি জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে সুগন্ধির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

–হ্যাঁ, ভালোবেসেছি। আর তা শুরু হয়েছে এই কয়েক মুহূর্ত আগে থেকে।

আমি কোনো কথা বলছি না দেখে সুগন্ধি খিলখিল করে হেসে ফেললো।

–ভয় পাচ্ছেন?

আমি চুপ করে থাকলাম।

–তোমাকেই ভালোবেসে ফেলেছি কবি।

আমি দেখলাম সুগন্ধি এর মধ্যে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে।

আমরা ততক্ষণে রাস্তার হট্টগোলের মধ্যে আর স্বচ্ছন্দে চলতে পারছিলাম না। সুগন্ধি আমার হাত ধরে টেনে ফুটপাথের এক সাইডে দাঁড়িয়ে পড়লো।

–এভাবে আর চলা যায় না। রাস্তা ভিড়াক্রান্ত। এখন একটা স্কুটার বা রিকশা নিলে হতো, তুমি তো যার বাসায় যাচ্ছো সে হলো ওই মরীচিকাটির বান্ধবী। ভালো আচরণ পাবে বলে আন্দাজ করে বসে থেকো না। চলো, সিএনজি নিয়ে গিয়ে হাজির হই। আমি হাত বাড়িয়ে একটা সিএনজি থামালাম।

–এসো।

আমি আর সুগন্ধি সিএনজিতে উঠে বসলাম।

গাড়িটি চলতে শুরু করল।

–তুমি তো আমাকে ভালো করে জানো না, সুগন্ধি।

–ভালো করে জানলে কেউ কারো প্রেমে পড়তো না। মিলন-বিরহ এসব শব্দের কোনো অর্থ হতো না। আমি তোমাকে জানি না বলে তোমার সাথে চলতে শুরু করেছি। আমি তো বলেছি এই শহরের সব দরজা আমি খুলে ফেলবো। তুমি তো জিজ্ঞেস করলে না কার জন্য খুলবে?

আমি চুপ করেই থাকলাম।

–একজন পুরুষের জন্য খুলবো, শুধু একজন পুরুষের জন্য। সে হলে তুমি।

হাঁটতে হাঁটতে আমার ডাইরিতে লেখা একটা ঠিকানা অনুযায়ী একটা চারতলা বাড়ির নিচে চলে এলাম।

–তুমি একটু দাঁড়াবে, আমি উপর থেকে আসি।

–না, দাঁড়াবো না, তোমার সাথে যাবো। কে কী ব্যবহার করে তা দেখার জন্যই তো এসেছি। আমাকে নিচে রেখে তুমি যেতে পারবে না। আমাকে সাথে নিয়ে চলো।

–তাহলে এসো।

আমরা সোজা দোতলায় উঠে গেলাম। দরজায় টোকা দিতে ভেতর থেকে হাসি-হল্লার আওয়াজ তুলে এক যুবতী দরজা খুলে দিলো। সামনে আমাদের দেখে কিছুটা বিব্রত সে।

–কাকে চাই?

–আমরা কাশিদার বান্ধবী, মুনীরার কাছে এসেছি। মুনীরা কি আছেন?

–আমিই মুনীরা, আপনাদের উদ্দেশ্য কী তা জানতে না পারলে ভেতরে আসতে বলবো না।

সুগন্ধি বেশ ক্রুদ্ধ হলো।

–আমরা ডাকাতি করতে এলে আপনার গালে আগে একটা চড় মারতাম। কিন্তু আমরা ডাকাতি করতে আসিনি। একটা ঠিকানার জন্য এসেছি। ঠিকানাটা সৈয়দা কাশিদা বানুর।

মুনীরা নামটা শুনেই রাগতস্বরে বললো

–বদমাশ মেয়ে। তাকে আপনাদের কী প্রয়োজন? আপনারা কি জানেন আপনারা যাকে খুঁজছেন সে কত মানুষের ঘর ভেঙেছে?

–সেটা তো জানি না বোন। তবে এটা জানি তার চেয়ে প্রতারিত দুঃখী মহিলা এ শহরে আর একজনও নেই।

আমি বললাম।

এবার মুনীরা দরজা থেকে সরে দাঁড়ালো।

–আসুন, ভেতরে!

আমরা ভেতরে গিয়ে বাঁ দিকের গলি ধরে এগিয়ে গিয়ে একটা মস্তবড় ড্রইংরুম পেলাম। দামি সোফায় সজ্জিত। এগিয়ে এলো মুনীরা।

–একটু চা দেবো?

–না, আমরা চা খাবো না। শুধু একটা জিনিস জানতে চাই– কাশিদার সাথে কোনো রকমে আমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে কি না?

–না বোন, সেটা সম্ভব নয়, কারণ সে অত্যন্ত হিংস্র ধরনের মেয়ে। আমি ঠিকানা দিয়েছি জানতে পারলে আমাকে একদম মেরেই ফেলবে। বড়ই হিংস্র প্রতিশোধপরায়ণ নারী এই সৈয়দা কাশিদা বানু। আমি আপনাদেরও সাবধান করছি তার সাথে দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করবেন না।

–কিন্তু আমরা যে তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যই রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছি। সাথে সাথে মুনীরা চিৎকার করে উঠলো,

–ভুল করেছেন, আপনাদের দেখামাত্র সে গুলি করে দেবে। তার হাতে একটি পিস্তল আছে।

আমার খুব হাসি পেলো।

–আমরা যদি তার আগেই তাকে গুলি করি।

এবার মুনীরা অনেকটা থতমত খেয়ে গেল।

সুগন্ধি এতক্ষণ আমাদের কথাবার্তা শুনছিল। মুনীরার দিকে ঘাড় ফেরালো সে।

–তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ মুনীরা, আমরা আসলে কাশিদা বানুর সাথে একটু কথা বলতে চাই। কিন্তু গুলিগালার কথা শুনে আমাদের মনে হচ্ছে অতটা গরজ দেখানোর দরকারই বা কী! একজন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। যদি তিনি পরী-টরী না হন তাহলে আমরা তাকে স্বাভাবিকভাবে আমাদের সাথে আচরণ করার সুযোগ দেবো। বাড়াবাড়ি করলে আমরাও তো মানুষই বটে। খারাপের সাথে খারাপ, ভালোর সাথে ভালো। বিপদে পড়ে গেছি আমরা কারণ আমরা একজনকে হারিয়ে ফেলেছি, সে এক অস্বাভাবিক মেয়ে। তাকে স্বাভাবিকতায় আনতে আমরা শুধু চেষ্টা করছি। না পারলে আমরা কেনই বা তাকে ঘাঁটাতে যাবো। জাহান্নামে যাক সে।

আমাদের কথা শুনে মুনীরা কতক্ষণ চুপ করে থাকলো। তারপর খুব মৃদু স্বরে বললো–

–যাবেন না, বোন। বাঘিনীর কাছে কেউ যায় না। দেখুন, আমিও তো দূরে থাকি। অথচ আমার সাথে তার সেই ইউনিভার্সিটি থেকে কত খাতির ছিল। তার জন্য আমি কী না করেছি। মনে রাখবেন, সে পরের ধন কেড়ে নেয়। সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক। সে অন্যের সম্পর্ক সহ্য করতে পারে না। এক পাপীয়সী নারী, বলা যায় সমাজের কলঙ্ক। আপনারা ফিরে যান।

সুগন্ধি এতক্ষণ পর্যন্ত মহিলার সব কথা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করছিল, তারপর খুব ধীরেসুস্থে মুখ খুলতে চাইলো।
–আমাদের অতো গরজ না থাকলেও আমরা বিষয়টি নিয়ে আরো কিছু দূর অগ্রসর হবো। কারণ একজন নারী অস্বাভাবিক আচরণ করছে– কেন করছে, তার শক্তিই বা কতটুকু, এটা আমরা উদঘাটন করবো। এটা করতে এসে আমার অনেক লাভ হয়েছে। এই কবিকে আমি ভালোবাসতে পেরেছি। এবং জগতে অনেক অসঙ্গতি র কারণ জানতে পেরেছি। আমরা এসব ব্যাপারে ভেবেছিলাম তোমার সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি তুমি আত্মগোপনকারী সৈয়দা কাশিদা বানুর ভয়ে নিজেই খুব ভীত হয়ে আছো। ভীতু মানুষের আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা নাক বরাবর হাঁটতে চাই। জানতে চাই একজন নারী কিসের অভাবে নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে। এই রহস্য আমরা জানবোই। আচ্ছা তাহলে উঠি।
–ইচ্ছে করলে এ ব্যাপারে আমাকেও সঙ্গে নিতে পারতেন, কারণ কাশিদাকে তো আপনারা চেনেন না। কখনো দেখেননি হয়তোবা। কিন্তু আমি তার সহপাঠী বান্ধবী ছিলাম। তাকে সহজেই চিনি-জানি এবং বান্ধবীই মনে করি। আমার মনে হয় আপনারা অযথাই বিষয়টাকে জটিল ভাবছেন। কিন্তু আমার ধারণা, ঠিকানাটা জানা থাকলে এর মধ্যে কোনো জটিলতা নেই। আসল দরকার হলো ঠিকানাটা। যদিও কাশিদা মাঝে মধ্যে মোবাইল ফোনে তার যাকে দরকার তার সাথে কথা বলে। তাহলে আর চিন্তা কী! এমন তো নয় সে কারো সাথে কোনো সম্পর্কই রাখে না।
–তুমি ঠিকই বলেছ, মুনীরা। কিন্তু আমরা ঠিকানা ছাড়া একজন মহিলাকে উদঘাটন করতে চেষ্টা করছি। ঠিকানাটা পাওয়ার জন্য আমাদের একসাথে পরামর্শ করে কাজ করা উচিত। ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে যখন আমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়েছে তখন প্রত্যাখ্যানও এই ঠিকানার জন্য সৃষ্টি হবে। যা হোক আমরা কাশিদা বানুর উদ্দেশে আমাদের সব অনুসন্ধান চালিয়ে যাবো। এখানে কেউ কিছু নয়।

আমি বললাম– ব্যাপারটা হলো একজন নারীর ঠিকানা, হদিস। এটা যতই রহস্যময় হোক এর মধ্যে বাস্তবতাও আছে– কে কাকে লুকিয়ে রাখতে চাইছে এটা বড় কথা নয়– বড় কথা হলো একজন নারীর ঠিকানা এই মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মুনীরা আমাদের সাহায্য করতে চাইছে, আমরা কেন তাকে নেবো না।

এ কথায় সবাই চুপ হয়ে গেলাম। হেসে উঠলো মুনীরা।

–আমাকে নিলে আপনাদের ভালোই হবে। আর আপনাদের বলেছি তো আমি সৈয়দা কাশিদা বানুকে ভালো করে চিনি। কেউ তার বন্ধুত্ব কামনা করবে– এটা তো আমার বিশ্বাস ে না। অন্তত যারা কাশিদাকে চেনে, এর মধ্যে তো তার ব্যাপারে খানিকটা আলোচনা হয়েছে।

আমি বললাম–

আপনি যখন যেতে চাইছেন, স্বেচ্ছায় যেতে চাইছেন– তাহলে চলুন। আমাদের সাথে যাওয়ার ব্যাপারে কারো তো কোনো আপত্তি থাকার কিছু নেই। যদিও দল বেঁধে একটি রহস্যময় মেয়েকে খোঁজার কোনো মানে হয় না। তো আমার সঙ্গিনী সুগন্ধি একটু বেশি কৌতূহলী। যদিও আমারও কৌতূহল কম নয়। আর যা-ই হোক কাশিদা বানু মানুষ তো বটে। ভূত-পেত্নী হলে অবশ্য অন্য কথা। জিনের পেছনে আমরা ছুটতে পারবো না।

এ কথা শুনে সবাই নিঃশব্দে হাসলো।

আমি আবার বললাম,

–কাশিদা মেয়ে যখন– মেয়েদের স্বভাব অনুযায়ী নিশ্চয়ই সে কোনো শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কোনো পুরুষের শক্তি কিংবা জাদুর শক্তি। কথা হলো, মুনীরা, আপনাকেও আমরা নিতে চাই। একসাথে এখনি বেরিয়ে পড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমাদের সবারই মোবাইল আছে। আমরা যোগাযোগ করে এগোব। বর্তমানে আমি যে ঠিকানায় অবস্থান করছি– এটাই আমাদের অফিস। আপনি আমার মোবাইল নম্বর টুকে নিন। যোগাযোগ করতে সুবিধা হবে। আমি আপনার নম্বারটা তুলে নিচ্ছি।

এই ফাঁকে আমি লক্ষ করলাম মুনীরা সত্যিই সুন্দরী মেয়ে। চেহারা-গড়ন ছিমছাম– একটু শ্যামবর্ণা হলেও দারুণ আকর্ষণীয়া নারী। আমি তার নম্বর টুকে নিচ্ছি দেখে সুগন্ধি খুব তির্যক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আমি একটু উদাসীনতার ভান করে সুগন্ধিকে বললাম

–তুমিই বরং মুনীরার নম্বরটা টুকে নাও না কেন! আমার মোবাইল এর মধ্যেই প্রায় ফিলাপ।

সুগন্ধি কোনো কথা না বলে তার মোবাইলটা বের করে।

–মুনীরা, নম্বরটা বলো।

মুনীরা মোবাইলটা হাতে নিয়ে অনেকগুলো নম্বর বলে গেল। বিষয়টা এখান থেকে ভিন্ন দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে। কারণ মুনীরা হেসে বললো–

–আমি আপনাদের সাথে যেতে চাই এটা যেমন ঠিক। তেমনি দল বেঁধে কোথাও যাওয়া অস্বস্তিকর। আমি কবি সাহেবের বর্তমান অবস্থানস্থলে নিজেই গিয়ে হাজির হবো। তবে আমার মনে হয় কাশিদা এর মধ্যেই আমাকে টেলিফোন করবে। শাসাবে বলে মনে হয় না, তবে আমার ক্ষতির চেষ্টা অবশ্যই করবে। আমাকে কাশিদা একদম সইতে পারে না– সেটা আমি জানি। আমি তো আর ওর রূপের প্রশংসা করি না। গুণও তার তেমন কিছু নেই, তবে হিংস্রতা আছে– তেজ আছে। এই তেজ অবশ্য পুরুষরা পছন্দ করে। আমার কাছে বেয়াদবি বলে মনে হয়।

আমরা মুনীরার বাসা থেকে বেরিয়ে এলাম। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে। রাস্তাঘাটে প্রচণ্ড ভিড়। ফুটপাথেও জনচলাচল উপচে পড়ছে। চতুর্দিক প্রাত্যহিক মানুষের কলরবমুখর। আমরা একটা ফুটপাথ ধরে হাঁটছিলাম। আমি আর সুগন্ধি। মুখ খোলে সুগন্ধি।

–দাঁড়াও, তোমার তো সুন্দরী মেয়ে দেখলে খুৎপিপাসার বালাই থাকে না। আমার খিদে পেয়েছে। সামনে একটা ভালো রেস্তরাঁ আছে। চলো, খেয়ে নিই।

আমরা গিয়ে রেস্টুরেন্টে ঢুকলাম।

খাবার চেয়ে অর্ডার দিলো সুগন্ধি। আমরা খাবার এলে ধীরেসুস্থে খেতে শুরু করলাম। খেতে খেতে সুগন্ধি বলল– দেখো, তোমার ব্যাপারে ঐকটা কথা বলতে চাই।

–আমি জানি তুমি কী বলবে।

–জানবেই তো, দুষ্ট লোক সব সময় নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সতর্ক থাকে।

আমি হাসলাম।

–তুমি আবার একটা ভয়ানক বিপাকে পড়ার আয়োজন করে চলছো।

–মানে?

–অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে মুনীরার পিছু ধাওয়া করা ঠিক হবে না।

–আমি চমকে গেলাম। আমার মনের ঠিক জায়গায় হাত দিয়েছে সুগন্ধি। আমাকে সতর্কবাণী শোনাচ্ছে। তবে মুহূর্তের মধ্যেই এটাও মনে হলো মুনীরার চেয়ে সুগন্ধি অতটা লাবণ্যময়ী নয়। প্রকৃতপক্ষে মুনীরা অনেক তরতাজা, সুন্দরী যুবতী। রূপ যেন উপচে পড়ছে মুনীরার। আমি খেতে খেতে একবার আড়চোখে সুগন্ধিকে দেখছিলাম। সুগন্ধি সেটা আন্দাজ করে অকস্মাৎ হেসে ফেললো।

–চোরা চাওনিতে আমাকে দেখতে হবে না। আমি মুনীরার পাশে তেমন কিছু নই, কিন্তু আমাকেই তোমার বেশি দরকার। অনেক দিন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে দরকার। মুনীরা সেটা দিতে পারবে না। আর তোমাকে দেবেই বা কেন? তুমি তো আর আকাশের চাঁদ নেমে আসোনি। যা বাস্তবতা তা মেনে হিসাব করে তোমার চলা উচিত। কারণ তোমার তো আবার দেশব্যাপী কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে।

আমি সুগন্ধির এই বিশ্লেষণে অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। দ্রুত খাচ্ছি দেখে সুগন্ধি হেসে ফেললো

–তুমি উত্তেজিত হয়ে পড়েছো। ধীরে খাও। আমি কোনো বাঘ-ভালুক নই। একটা মেয়ে মাত্র।

এ কথায় আমি চকিতে একবার সুগন্ধির দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে আনলাম। সুগন্ধি আবার বললো

–ধীরে খাও। এতো উত্তেজিত হয়ে পড়েছো কেন? তুমি কি বোঝো না মুনীরার মতো মেয়েরা আসলে মায়া-মরীচিকা। অনেকটা কাশিদা বানুর মতোই। আর আমাকে তো তোমার সামনেই দেখতে পাচ্ছো। আমাকে যা দেখছো আমার স্বভাবও তেমনি।

এ কথায় আমি একটু চমকে গেলাম। সুগন্ধি তার মৃদু স্বভাব ও তার সৌন্দর্যের কথা আভাসে জানাতে চাইছে। বলতে চাইছে তার মধ্যে কোনো উগ্রতা নেই। আমাকে আরো প্রলুব্ধ করতে চাইছে। আমি সহসা বলে ফেললাম

–আমি তো তোমাকে ভালোবাসি।

–ডাহা মিথ্যে বলছো, ভালোবাসো না, তবে ভালোবাসার চেষ্টা করছো। আমাকে যাচাই করছো। বেশ তো করো না। যাচাই করেই তো নিতে হয়। আমি তোমার ভালোবাসার মধ্যে টিকে গেলে আমাকে কিন্তু আর ফেলে পালাতে পারবে না। সে চেষ্টা করলে আমি কিন্তু তোমাকে সহজে ছাড়বো না। যাচাই করে নাও ঠিক আছে, নিলে আর ফেলতে পারবে না।

খাওয়া শেষ হলে বিল মিটিয়ে আমি ও সুগন্ধি বাইরে এসে পানের দোকানে দাঁড়ালাম। আমি সিগারেট নিলাম– দাম মিটিয়ে দিলো সুগন্ধি। খাওয়াসহ সবকিছুর দাম মিটিয়ে দেয়াতে আমি সুগন্ধিকে বললাম, সবকিছু তুমিই দিলে।

সুগন্ধি হাসলো। বললো–

–দিলাম না নিলাম।

তারপর খিলখিলিয়ে কিশোরীর মতো একফলক হাসি ছড়িয়ে দিলো।

–হায়রে স্বার্থপর পুরুষ, বেশি হিসাব করতে গিয়ে সব কিছুতেই বোকা বনলে।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে আমার পেটে ধাক্কা দিয়ে সুগন্ধি এক জায়গায় আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলো।

–দাঁড়াও, একটু কথা বলি।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম।

–আমাকে বিয়ে করবে?

আমি মাথা নাড়িয়ে 'হ্যাঁ' বললাম।

–কেন বিয়ে করবে, আমার সম্বন্ধে কী জানো?

খুব আকস্মিক নাড়া দেয়ার মতো প্রশ্ন করলো সুগন্ধি। আমি খুব নিচু স্বরে বললাম-

–কিছু জানি না। আর জানি না বলেই মনে হয়– তোমাকে বিয়ে করতে পারবো।

–আর যখন জানবে তখন পালিয়ে যাবে আমাকে ফেলে।

আমি হাসতে লাগলাম।

–এমন কী আছে তোমার মধ্যে যা ফেলে পালিয়ে যেতে হয়, আমাকে তুমিই বলে দাও না!

–তাহলে শোনো, আমার মধ্যে আছে অপ্রেম, স্বার্থপরতা, সব সময় পুরুষকে দখলে রাখার চেষ্টা। আছে হিংস্রতা। যা চাই তা না পেলে আমি খুনও করতে পারি। কিন্তু তুমি তা পারবে না। আমি তোমাকে ঠিকমতো চিনে ফেলেছি। চিনে-জেনে পছন্দ করেছি। এখন তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না। তুমি চাও বা না চাও– আমি তোমার বউ হবোই, বুঝলে!

আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম– না, কিছুই বুঝতে পারলাম না, তবে আমার বউ হওয়াতে তোমাকে বাধা দেয়ার এতটুকু ইচ্ছা আমার নেই। এখন থেকে আমি বলবো তুমি আমার বউ। ঠিক আছে।

সুগন্ধি চিৎকার করে উঠলো।

–কিছুই ঠিক নেই, তুমি একটা বদমাশ, তুমি একটা কসাই। শুধু মাংস– শুধু মাংস। হায় আল্লাহ! এ কোন কসাইয়ের পাল্লায় পড়েছি।

আমি মুখে হাসি ধরে রেখে সুগন্ধির মাথায় হাত রাখলাম।

–না, শুধু মাংস নয়, শুধু কসাইবৃত্তি নয়। মানুষের মনুষ্যত্ব এর মধ্যে আছে, সুগন্ধি। মানুষ চেষ্টা করে ভেতরের মানুষটাকে মেরে ফেলতে। কিন্তু সে নিজেই ভেতরের মানুষের হাতে নিহত হয়। হেরে যায়। আসলে ভেতরটাই বড়। বাইরের দেখানোপনাটা বড় নয়। এমনিতে দেখতে তুমি তো একটি মেয়ে মাত্র। অথচ ভেতরে তোমার মধ্যে জগৎ-সংসারের দেনা-পাওনা চলছে। লাভ-লোকসানের হিসাব চলছে। যদি তুমি সত্যিকারের মানুষ হও, নারী হও– তাহলে তোমার লোকসানের পাল্লাই ভারী দেখবে। তুমি শুধু ঠকবে। প্রতারিত হবে। বঞ্চিত হবে। প্রকৃত মানবী কখনো জেতে না।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত সুগন্ধি স্তম্ভিত হয়ে, ভীতবিহ্বল হয়ে আমার ধমকগুলো হৃদয়ঙ্গম করলো। তারপর অনেকটা হাত-পা ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে আমার দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে কাতর স্বরে বললো

–আমাকে একটু ধরবে, তা না হলে আমি পড়ে যাবো। চলো, আজ আমরা ফিরে যাই তোমার আস্তানায়।

পরের দিনের কথা।

মুনীরা নিজের ঘরে বালিশে ঠেশ দিয়ে পত্রিকা দেখছিল। এ সময় বেজে উঠলো তার মোবাইলটি। কানে তুলে হ্যালো বলতেই চিৎকার ও গালাগালির শব্দ শুনতে পেলো মুনীরা।

–তুই একটা হারামজাদী। তুই ইউনিভার্সিটিতেও খুব স্বার্থপর ছিলি। এখন আমার সাথে একই ব্যবহার করছিস। কেন করছিস? আমি তোর খাই না পরি? না তোকে ঘাঁটাতে গিয়েছি? আমি একটু লুকিয়ে থাকতে চাই। তুই কেন প্রতিজ্ঞা করেছিস আমাকে খুঁজে বের করার। তুই জানিস আমার এমন ক্ষমতা আছে যে, আমি তোকে মেরে ফেলতে পারি।

–কিন্তু আমি তোর ভালো চাই, কাশিদা।

–আমার ভালো চাওয়ার মানে কি তুই জানিস? শোন, আমাকে ফেরাতে পারবি না। আমি আমার নিজের চতুর্দিকে রহস্য সৃষ্টি করে অনেক পুরুষের হৃদয়ের রক্ত নিংড়ে পান করবো। কেন করবো জানিস? কারণ একটি পুরুষ আমাকে ধ্বংস করে পালিয়েছে। আমি একটা ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু আমি প্রতিহিংসাপরায়ণ হিংস্র মানবী। আমি সব ধ্বংস করে দেবো। তোকে একটা অনুরোধ, আমার ভালো চাওয়ার দরকার নেই। তুই ওই শয়তান কবিটার পাল্লায় পড়বি না। সে অবশ্য আমার কোনো ক্ষতি করেনি। কিন্তু পুরুষমাত্রই খারাপ-অসভ্য-বেঈমান।

মুনীরা খিলখিল শব্দে হেসে ফেললো।

–দেখ কাশিদা বানু, আমরা সব সময় পুরুষদের প্রকাশ্যে গালিগালাজ করি। কিন্তু রাত হলে তাকেই বিছানায় চাই। তুইও তা-ই। তবে আমি একটু ব্যতিক্রম– কারণ আমাকে ছুঁয়ে কেউ পালায়নি। আমি যাদের পছন্দ করি তারা সবাই– তুই যেমন দেখেছিস তাদের চেয়ে উঁচু স্তরের মানুষ। আমার একটা টার্গেট আছে। খুব বড় টার্গেট। যদি আমি সেটা ধরতে পারি– ছুঁতে পারি– বুকে চেপে শান্তি পেতে পারি– তাহলে জানবি আমি সত্যিই মুনীরা বেগম। আমি চেষ্টা করছি।
কাশিদা বিদ্রূপের হাসিতে খিলখিল করে উঠলো।
–তুই হারামজাদী– সব সময় মনে মনে আমাকে ছাড়িয়ে যেতে চাস। আমি কিছুই বুঝি না, ভাবিস? আমি তোকে সেটা হতে দেবো না।
–কেন দিবি না? আমি কি তোর কিছু কেড়ে নিচ্ছি।
–তা নিচ্ছিস না বটে। কিন্তু তুই আমার মতো একটা মেয়ে হয়ে সুখের জীবন কাটাবি– এটা আমি হতে দেই কেমনে?
এ কথায় মুনীরা হঠাৎ লাইনটা কেটে দিয়ে পকেটে রেখে দিতে গেলে মোবাইলটা বেজে উঠলো আবার। বুকের বাঁ পাশটা সম্পূর্ণ গোলাকারে ঝিঁ ঝিঁ শব্দ তুলে যেন বেজে উঠেছে বলে মনে হলো মুনীরার।
সে বুকের উপর এবং একই সাথে ফোনের উপর হাতটা চেপে ধরলো। কিন্তু ভেতরে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে একালের যান্ত্রিক শব্দের ছোঁয়া। অনেকক্ষণ এভাবে বুক চেপে ধরে দাঁড়িয়ে থেকে মুনীরা মোবাইলটা কানে তুলে চিৎকার করে উঠলো।
–হ্যালো, হ্যালো, বল কী বলতে চাস? আমি তোর জ্বালা জুড়িয়ে দিতে পারব না। তোকে লোকে বাঘিনী বলে, কিন্তু আমি জানি তুই একটা গৃধিণী। তুই ভাবিস তোর পুরুষটাকে আমি ছলনা করে সরিয়েছি। কিন্তু আমার তাতে লাভ কী? তুই কি জানিস তোর পুরুষটা ছিল অত্যন্ত খারাপ–বদমাশ লোক। মেয়ে দেখলে ওর চোখে-মুখে লালসার আগুন জ্বলে উঠতো। এই তো ছিল তোর পুরুষ। আমি পা দিয়েও তোর পুরুষের মুখে বাও দেই না। আরো একটা কথা জেনে রাখিস– তুই আমার কাছে, আমার পায়ে একদিন এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বি, কারণ আমি তোকে সব দিক থেকে একেবারে শূন্য করে ছাড়বো। কথাগুলো মনে রাখিস।
এতে চাপা উচ্চহাস্য করে উঠলো কাশিদা বানু। মুনীরা ধীরেসুস্থে মোবাইলটা ভাঁজ করে রাখা মাত্র তার মনে হলো মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠছে। সে মাথার নিচে বালিশটা টেনে এনে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো।

–হায় আল্লাহ! আমার যন্ত্রণার কোনো শেষ নেই, প্রভু...

ঠিক এ সময় প্রায় উন্মত্তের মতো মুনীরার ঘরে প্রবেশ করলাম আমি। আলুথালু ও অসংবৃত অবস্থায় মুনীরাকে দেখে চোখ নামিয়ে মৃদুস্বরে বললাম– আমি এসেছি।

মুনীরা দু'চোখ মেলে বললো– কই, আমি তো কাউকে ডাকিনি!

–না, আমি তোমার ডাক শুনতে পেয়েছি। তোমার হৃদয় আমাকে ডাকছে। তোমার সমস্ত দেহমন আমাকে ডাকছে, তুমি না করলে তো চলবে না। এই তো আমি এসেছি।

মুনীরা বিছানায় উঠে বসলো এবং আঙুল তুলে আমাকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করলো।

মুনীরা উঠে একবার টয়লেটের দিকে গেল এবং কিছুক্ষণ পর ভেজা মুখ তোয়ালেতে মুছতে মুছতে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

–আমি তো বলেছি, আমি কাউকে ডেকে আনিনি। আপনি আমার কাছে এসে যদি শান্তি পান তাহলে আসবেন। কিন্তু আমরা সবাই কাশিদা বানুর হিংস্রতার শিকার। সে চাইছে আমার সাথে কারো কোনো সম্পর্ক থাকবে না এবং এই আপনাকেও সে টোপ ফেলবে আর আমি জানি আপনিও ফেঁসে যাবেন। আসলে কাশিদার রহস্য জানতে এসে পুরুষমাত্রই প্রেমে পড়ে যায় আর কাশিদা এই সুযোগটুকু ব্যবহার করে। আপনাকে আমি হুঁশিয়ার করছি– খবরদার! কাশিদা আপনাকে গিলে ফেলবে।

আমি একটু ভড়কে গেলাম। আবার একই সাথে লক্ষ করলাম মুনীরা অসাধারণ লাবণ্যময়ী মহিলা। আমি আড়চোখে মুনীরাকে লক্ষ করছি টের পেয়ে মুনীরা মৃদু মৃদু হাসছিল।

–আমাকে দেখছেন, আমি দেখতে অতো মন্দ নই। তাছাড়া আমার ভালোবাসারও শক্তি আছে। আমি কিন্তু প্রথম থেকে আপনার প্রতি এক ধরনের টান অনুভব করছি। কবিমানুষ আমাদের মধ্যে এসে পড়েছেন কিন্তু আমরা তো কেউ মানুষ নই। একদল লোভী জানোয়ারের মতো।

এসব কথা আমি স্তম্ভিত হয়ে শুনছিলাম। ভাবছিলাম এসব বলার মানে কী। হঠাৎ আমি ঘাড় ফিরিয়ে মুনীরাকে বললাম

–আমার এসবে লাভ কী? কেনই বা আমি কাশিদা বানুর রহস্য-ঠিকানা, ঘরবাড়ি অনুসন্ধান করতে যাচ্ছি। যখন জানি কাশিদার মতো হিংস্র নারী আর হয় না।

আমি ভয় পাচ্ছিলাম। সুগন্ধিকে আমি বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি অথচ আমার মনের মাঝখানে এই মুহূর্তে সব কিছু নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে

প্রস্তুত এক অসাধারণ লাবণ্যময়ী নারী। তার নাম মুনীরা বেগম। আমি বুঝতে পারলাম যে, পুরুষের পছন্দের অনেক রকম ভেদ আছে। পুরুষ বিশ্বস্ত নয়। এই মুহূর্তে আমি যেমন– মনে হয় সব পুরুষই একই রকম। সুগন্ধিকে বউ বলে এসেছি। কিন্তু মুনীরা এই মুহূর্তে আমার সাথে সম্পর্ক করার জন্য এক ধূম্রজাল সৃষ্টি করে আছে। আর আমি ধীরে ধীরে গলে যাচ্ছি মোমের মতো।

এই যে নিজের বিষয়ে আমার অনুতাপ সৃষ্টি হচ্ছে, এর জন্য আমি গভীরভাবে অভিভূত। সম্ভবত একেই বলে বিবেচনা শক্তি বা বিবেক। হঠাৎ মনে হলো আমার বিবেক জেগে উঠেছে।

আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু মুনীরা আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার একটা হাত ধরে ফেললো।

–কী কবি! এত তড়বড় করছেন কেন? আপনি তো সুগন্ধিকে আপনার যোগ্য নারী ভেবে বসে আছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আপনার সিদ্ধান্ত বদলে দিয়েছি। কারণ আমি সুগন্ধির চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়, বেশি লোভজাগানিয়া মেয়ে। এই মুহূর্তে আমাকে আপনার চাই। চাই নাকি?

আমি আমার অবস্থায় এখন অস্থির হয়ে উঠেছি। ভাবছি মুনীরা এই মুহূর্তে যে ধূম্রজাল বিস্তার করেছে তার কোনো তুলনা নেই। মনে হলো মুনীরাকে পেলে আমার আর কাউকে চাই না। কিন্তু আমার জন্য এর চেয়ে লজ্জাকর বিবেকহীন সিদ্ধান্ত আর হতে পারে না। মুনীরা আমার হাত চেপে ধরেছে। ধীরে ধীরে ফিসফিস করে বলছে–

–এরা আপনাকে কী দেবে? কিছুই না। আমার কাছে আছে সুখ-শান্তি– নারীর গায়ের উষ্ণ ওম। সিদ্ধান্ত বদলাতে হবে। কেউ তোমার বউ না কবি। অতীতে কেউ তোমার বউ ছিল না। শুধু আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমার মধ্যেই সব পাবে– সুখ-শান্তি ও বিশ্রাম।

মুনীরার ছোঁয়ার উষ্ণতা তার কম্পিত হাতের মধ্য দিয়ে আমার ভেতরে প্রবেশ করতে লাগল। আমি কি অবশ হয়ে যাচ্ছি? আমার কি মুনীরার গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো উচিত? কিছু বুঝতে না পেরে আমার দেহটা একখণ্ড কাঠের মতো কাঁপতে লাগল, যেন পায়ের নিচে ভূমিকম্প চলছে। হঠাৎ মুনীরা চিৎকার করে উঠলো।

–কী সর্বনাশ! তোমার তো জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। তোমার এখনি কোথাও লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়া উচিত। এখন আর কোথায় যাবে। এই খাটেই শুয়ে পড়ো।

আমি মুনীরার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে মুনীরা হেসে ফেললো।

–কী ব্যাপার, অমন করে আমাকে কী দেখছ? শুয়ে পড়ো। তারপর দেখা যাবে কোথায় তোমার ঠিকানা।

আমিও বালিশের ভেতর মুখ গুঁজে বিছানায় ঢলে পড়ে গেলাম এবং কেন জানি শিশুর মতো কাঁদতে ইচ্ছা হলো। আমি কাঁদতে লাগলাম। আমার মুখ ও পিঠ থেকে চাপা কান্নার গোঙানি বেরোতে লাগল। মুনীরা আমার এ বেসামাল অবস্থা দেখে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। একবার শুধু বললো

–কী সর্বনাশ! আমি এখন কী করি? তোমার বউকে খবর দেবো? আমি জানি সে তোমার বউ নয়। তোমার অপকর্মের সহচরী। এদের নিয়ে কিভাবে দিন কাটাও? যা হোক, আমার মুখে এসব মানায় না। আমি বরং চুপ করে থাকি। তোমাদের দুর্দশা দেখতে থাকি।

এ সময় তার মোবাইল বেজে উঠলো। কানের কাছে নিলো মুনীরা।

–বল, কী বলতে চাস? আমার সাথে দেখা করবি, তোর সুবুদ্ধি জাগছে বুঝে ভালোই লাগছে। ফিরে আয়, এসে যাকে খুশি তাকে নিয়ে ঘর কর। ওই সব রহস্যময় জীবন তোর সাজে না, কাশিদা।...

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে একটা হাসির শব্দ শুনতে পেলো মুনীরা।

–শোন! তুই যদি সত্যিই সমাজে আর দশজনের মতো চলাফেরা করতে চাস তাহলে তোর ঠিকানাটা আমাকে বল, কাশিদা। আমি শুধু একাই তোর ঠিকানা জানবো আর কেউ জানবে না। আমি যাবো তোর কাছে। যদি তোর পাহারাদাররা আমার কোনো অনিষ্ট না করে।

–আমিও তোর সাথে দেখা করতে চাই। তোর ওই পুরনো বাসাটা তো? আমি আসবো। আসলে আমিও রহস্য চাই না। মিশতে চাই। তবে পুরুষগুলো সাংঘাতিক খারাপ। বেলেল্লা-বেহায়াপনার হদ্দ। তোর পুরুষগুলো কেমন?

কাশিদার কথা শেষ হতেই মুনীরা বললো

–আমি একটা মানুষকে নিয়ে বরং মুশকিলে পড়েছি। ওই কবি সাহেব। তুইও ভাল করেই চিনিস জানি। আমার মুখের দিকে শুধু হা করে তাকিয়ে থাকে।

কাশিদা হেসে বললো–

–তুই গলে যাচ্ছিস ওই লোকটার চোখের তাপে। তুই বুঝি মোম হয়ে যাচ্ছিস। ওগো আমার মোমের পুতুল।

বলেই শব্দ করে হাসলো কাশিদা বানু।

মুনীরা মোবাইলটা ভাঁজ করতে করতে একাকী হাসল।

–হায় গো রহস্যময়ী! সব রহস্যই তো একটা পুরুষের জন্য। না পাওয়া পর্যন্ত কত ঢঙ।

আমি অনেকক্ষণ মুনীরার বিছানায় জ্বরের ধকলে প্রলাপ বকতে লাগলাম। কিন্তু জ্বরটা হঠাৎ আমাকে এমন দৈবভাবে কাবু করে ফেলার রহস্যটা বুঝতে পারলাম না।

তবে বেশ কয়েক দিন ধরে আমার ভেতরে একটা মানসিক টানাপড়েন চলছিল। আমি কবিমানুষ– আমি কেন এই রহস্যময়ী নারীর মাকড়সার জালে আটকে পড়েছি। আমি পুরুষ। আমার কাজ হলো ভেঙে বেরোনো। আমি কেন এ কাশিদা বানু রহস্য উদঘাটনে নেমেছি এতে আমার লাভ কী? আমার এই স্বগতোক্তি মুনীরা মনে হয় কান পেতে শুনল। আমার দিকে ফেরে মুনীরা।

–তাহলে কী করবে? আমাকে ভালোবাসো আর বিয়ে করতে হচ্ছে একটা অজানা-অজ্ঞাত নারীকে যার নাম সুগন্ধি। অবশ্য আমাকেও তোমার তেমনভাবে জানা নেই। বিয়েটা কি তোমার জন্য খুব জরুরি?

–না নিশ্চয়ই না। আমি চলে যেতে চাই, সব কিছু থেকে বেরিয়ে যেতে চাই। এই তোমরা মেয়েরা আমার দিকে ছোবল দেয়ার জন্য ফণা তুলে আছ। আমি বেরিয়ে যেতে চাই। আমাকে ছেড়ে দাও আমি আর এসবের মধ্যে আসব না।

এ কথায় উচ্চহাস্য করে উঠল মুনীরা।

–তোমাকে কেউ ডেকে আনেনি। আমাদের কাউকে কেউ ডেকে আনেনি। আমরা এসে পড়েছি আমাদের অদৃষ্টের ধাক্কায়। কে একটি মেয়ে লুকিয়ে থাকতে চেষ্টা করছে তা আমরা জানতে চাই কেন? জাহান্নামে যাক লুকানো মেয়েটা। আমরা তার মুখও দেখতে চাই না। আমরা কেবল বেরিয়ে যেতে

চাই। সব নিয়তির মার থেকে পথে বেরিয়ে যাবো। আমি দেখতে ভালো। মাছির মতো ছেলেরা আমার মুখের উপর বসতে চাইছে। নোংরা-ভনভনে মাছি। আমি সব তুচ্ছজ্ঞান করি। আর দেখো তুমি কবি হও আর যাই হও তুমি হলে সব অনিষ্টের মূল। তোমাকে যারা আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে তারা আসলে সাহিত্যকে ভালোবাসে বলে এসব করছে। কিন্তু তুমি নিজে ভেবে দেখো তো তুমি কী? আমাকে দেখে তোমার ভালো লেগেছে। অথচ নারী মাত্রকেই তুমি তোমার খাদ্য ভাবো। ভাবো না?

আমি জ্বরের ঘোরের মধ্যেও এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পারলাম না।

—না, নিশ্চয়ই বিষয়টা এমন নয়। আমি মেয়েদের মধ্যে অনেক মহত্ত্ব দেখেছি। প্রেম, ভালোবাসা, মাতৃত্ব দেখেছি। আমি কেন নোংরা চিন্তায় নিজেকে নষ্ট করব।

এ কথায় শব্দ করে হাসল মুনীরা।

—তোমার দিব্যজ্ঞান হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু বিয়ের ব্যাপার যখন উঠেছে তখন তোমাকে মানতে হবে আমি কে, কার কন্যা, কোথায় নিবাস। এসব না জেনে আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে তুললে তোমার মহা অন্যায় হবে। তা ছাড়া আমি কোনো অসহায় মেয়ে নই। শিক্ষাদীক্ষাও আছে আমার। তোমাকে বিয়ে করলে আগে বাজিয়ে দেখব না? শুধু শরীরটাই তো সব নয়। মেয়েদের একটা মনও আছে। এটা বুকের পেছনেই থাকে। থাকে বুকের নরম মাংসের পেছনেই। কোনো মেয়েকে নিয়ে শুধু দেহ নিলে চলে না। ওই মনটাকেও নিতে হয়। যদি তুমি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো তাহলে আমার সবটাই নেবে। কিছু অংশ এখানে-সেখানে ফেলে রাখবে না। এখনো ভেবে দেখো আমাকে নেবে কি না।

এ কথায় আমি জ্বরের মধ্যে উঠে বসে গেলাম।

—আমি এক্ষুনি বাড়ি চলে যাবো। যেন একটি ছোট ছেলের আবদার— বাড়ি চলে যাবো মা।

মুনীরা আমার বাড়ি যাব শুনে আচমকা একটা ধাক্কা খেলো। তার মনে হলো সবারই মোহের ঘোর নেশার মতো মস্তিষ্কের অলি-গলিতে চলাফেরা করছে। সবাই ফিরে যেতে চায় যার যার বাড়িতে, কিন্তু কারো কোনো কালে বাড়ি ছিল না, এখনো নেই, যাকে বলে অস্থায়ী আস্তানা— যাকে ঠিকানা বলে— সবাই সেখানেই আছে। ঘোরের মধ্যে আছে— ভাবছে ভোর হতে দোর খুলবে। সবার মনের ভেতর একটা ভোর হলো দোর খোলো ভাব; কিন্তু কে জানে আদৌ সকাল হয়েছে কি না!

মুনীরা হেসে বলল–

–আমাকে নিয়ে এত চিন্তাভাবনা করতে হবে না কবি। দেখো আমি স্বাবলম্বী নারী। নিজের খাই এবং কলেজে পড়াই। যদি এটুকু পরিচয় আমার ব্যাপারে তোমার ধারণা না হয় তাহলে বলতে পারি– আমি এমএ পাস করেছি, আমার পিতা একজন কৃষক। তিনি তার নিজের জমি চাষবাস করেন এবং গ্রামে সুখেদুঃখে তার দিন চলে যাচ্ছে। তবে আমার জন্য তার দুর্ভাবনার শেষ নেই। সবাই বলে আমার বিয়ের বয়স হয়েছে। আমার জন্য বর দরকার। এখন আমার জন্য বর ঠিক করবে কে? আমার মুরব্বিরা করবেন। কিন্তু আমি নিজেই কি করতে পারি না? আমার তো কোনো বাধা নেই। আমি খুঁজতে খুঁজতে তোমাকে পেয়েছি। আমাকে খুঁটিয়ে দেখো এবং ভাবো তোমার চলবে কি না।

এ সময় জ্বরের ঘোরে নয়, চৈতন্যের চাবুকে আমি খাট থেকে নিচে নেমে দাঁড়ালাম। অনেকটা লাফিয়ে পড়ার মতো। প্রথমে আমার মনে হলো– মুনীরা আমার সব কিছু উন্মোচন করে দিয়েছে এবং নিজকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। আমি মুনীরাকে আবার ভেবে দেখার জন্য অনুরোধ করলাম।

–দেখো অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করবে। না দেখে লাফ দেবে না।

মুনীরা আমার কথায় কেমন যেন চমকে গেল।

–তুমি তো ঠিকই বলেছো। লাফ দিতে চাচ্ছিলাম কিন্তু না দেখেই। এখন আমার চেতনা হয়েছে তোমাকে জানার এবং তোমার বিষয়ে খোঁজখবর নেয়ার। তাহলে আমাকে একটু সময় দাও।

আমি হেসে বললাম–

–সবাই সময় চায়, একটু সময়। এই সময়ের মধ্যে কেউ কি কিছু জানতে পারে, না মানতে পারে? ভুল করে মানুষ নিয়তির প্ররোচনায় এবং শুধু ভুলই করতে থাকে। ভুলের নামই জীবন।

অনেকক্ষণ মুনীরা দাঁড়িয়ে ছিল। তার খাটে আমি শুয়েছিলাম। মুনীরা খাটের দিকে এগিয়ে এসে হেসে বলল– আমি একটু বসি। এতক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তা ছাড়া আমাদের কোনো সিদ্ধান্তও তো হবে না। অনেক কিছু জানার-বোঝার-দেখার আছে। আমি একটি মেয়ে বলেই আমাকে নিয়ে ছেলেরা কাড়াকাড়ি করবে– এটা আমি হতে দেবো কেন? আমি যাকে পছন্দ করি সেই আমাকে স্পর্শ করবে। আর সবাইকে আমি তাড়িয়ে দেবো। মাড়িয়ে চলব এবং দূরে দাঁড়িয়ে দেখব।

এ সময় আমার মনে হলো আমার আর কিছুতেই এখানে অবস্থান করা ঠিক হবে না। শারীরিক অবস্থা আমার যা-ই হোক। আমার এই মুহূর্তে বেরিয়ে পড়া উচিত। সুগন্ধি আমার জন্য নিশ্চয়ই তড়পাচ্ছে। তাকে একটা মোবাইলে হ্যালো করা উচিত ছিল– কিন্তু আমার মনে হচ্ছে সুগন্ধির তৃপ্তি হবে না, বরং আমাকে সশরীরে দেখতে পেলে তার হৃদয়-মন খুশিতে ভরে যাবে। আমি হঠাৎ মানসিকভাবে উজ্জীবিত হয়ে মুনীরার দিকে মুখ ফেরালাম।

–দেখো মেয়ে অত দর্প কোরো না। এই মুহূর্তে আমার মনে আরো একজন নারীর অপেক্ষমাণ চেহারা ও অস্তিত্ব আমি অনুভব করছি। সে হলো সুগন্ধি। আমি আর এক মুহূর্তও এখানে অপেক্ষা করতে রাজি নই, কারণ সুগন্ধি আমাকে ডাকছে।

আমার কথায় হেসে ফেলল মুনীরা।

–সবাই তার ভেতরের ডাক শুনতে পাচ্ছে। একে একে উঠে শুধু সে দিকেই ছুটবে। শুধু আমারই কেবল বুকের ভেতর মোরগ ডেকে ওঠে না।

এ কথাটা বলামাত্র মোবাইলটা বেজে উঠল মুনীরার। ফোনটা কানে লাগাতেই কাশিদার গলা।

–কী করছিস? আজ আমি আসব। কাউকে ঘরে ঠাঁই দিবি না। আমি এসে কিছুক্ষণ থাকব।

মুনীরা হেসে বলল, এত আড়ম্বরের কী দরকার, আমি তো জানি তুই আসবি। তুই যদিও রহস্য সৃষ্টি করেছিস কিন্তু আসল কথা হলো– তুই নিজেই আত্মপ্রকাশের জন্য পাগল হয়ে গেছিস। আর এ আত্মপ্রকাশ হলো কারো কাছে ধরা দেয়া, কোনো পুরুষ মানুষের কাছে। এই সত্যটা মুখে স্বীকার করতে চাস না কেন?

অপর প্রান্ত থেকে ধমকে উঠল কাশিদা।

–তুই থামবি?

–কেন থামব? তুই একজন পুরুষ খুঁজছিস। পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে লজ্জা কী?

–তাই খুঁজছি। আমরা সবাই তাই খুঁজে চলেছি। অথচ আমাদের পরিচিত পুরুষের সংখ্যা খুবই কম। তাই একজনেরটা নিয়ে অন্যজন কাড়াকাড়ি করি, তবে আমার মনে হয় এই কবি লোকটা খুবই রহস্যময়, তাকে একটু ভেঙে দেখতে হবে।

হাসল মুনীরা।

–এই তো এখন আমার বিছানায় আছে কবি।

এ কথা বলে মুনীরা এমন একটা হাসির শব্দ তুলল যা কেবল মেয়েরাই মাঝে মাঝে পারে।

অপর প্রান্ত থেকে ঈর্ষাকাতর কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এলো কাশিদা বানুর। শোন, আমি আজ তোর কাছে আসব। দরকার হলে সারাদিন থাকব। এ সময় কাউকে ঘরে রাখবি না।

–কিন্তু এই কবি অসুস্থ হয়ে এখন আমার বাসায় আছে। গায়ে জ্বর। তাকে তো আর বিদায় করতে পারব না।

–না তাকে বিদায় করতে হবে না। আমি আসব আমার কাজে। তুই শুধু সহযোগিতা করবি। এ হলো আমার অনুরোধ।

–আমি চেষ্টা করব। কিন্তু তুই যদি কোনো কারণে আমার ক্ষতি করার মতলব করে থাকিস, তাহলে আমিও তোকে ছাড়ব না কাশিদা, এটা মনে

রাখবি।

বলেই মোবাইল বন্ধ করে দিলো মুনীরা।

এদের কথাবার্তা আমার কানে আসছিল। ভাবলাম এ শহরে সবচেয়ে হিংস্র এক প্রাণী যার নাম কাশিদা বানু। সে আজ এখানে আসবে। আমার কেন যেন শঙ্কা হলো অন্য কোনো কাজে নয়, সে আসছে আমারই ক্ষতি করতে। কারণ আমি তার অজ্ঞাতবাসের আস্তানা খুঁজে বের করার প্রতিজ্ঞা করেছি। সন্দেহ নেই, আমি এর জন্য দায়ী বটে। আমিই বা কেন একজনের গোপন আস্তানা খুঁজে ফিরতে চাইছি। আমি নিশ্চয়ই অপরাধী। কাশিদা বানুর অধিকার আছে আমাকে প্রতিরোধ করার। মুনীরা আমার দিকে এগিয়ে এসে হতাশাগ্রস্ত গলায় জিজ্ঞেস করল

–এখন কী হবে কবি সাহেব।

–কী আর হবে? ক্ষতি হলে আমারই হবে। কারণ আমি কাশিদা বিবির আস্ত-ানা খুঁজে বের করতে চেয়েছি। এটা তো আমার অধিকারের মধ্যে পড়ে না। আমি কাশিদার ক্ষতি করতে চেয়েছি তাকে ঘরে থাকতে দেইনি। এখন সে আমার ওপর যেকোনো ধরনের প্রতিশোধ নিতে পারে। তবে তোমার এই ঘর থেকে আমাকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে।

–কোন নরকে যাবে? তুমি ভাবো ওই সুগন্ধি তোমার জন্য সব সুগন্ধ জমা করে রেখেছে বুকের ভেতর– তাই না!

এ কথায় আমি একটু চমকে উঠলাম। মুনীরা তাহলে সুগন্ধিকেও সন্দেহ করে। অথচ আমার পুরো মন ছেয়ে আছে সুগন্ধির চিন্তায়। আমি বললাম,

–তুমি যা কিছু বলো না কেন, সুগন্ধির সাথে তোমাদের তুলনা হয় না।

এ কথায় ফিক করে হেসে ফেলল মুনীরা। এই হাসিতে আমার মনে হলো অনেক কিছু লুকিয়ে আছে। আমি ধীরে ধীরে মুনীরার দিকে মুখ এগিয়ে বললাম–

–একটা কিছুর শেষ তো হতে হবে।

–শেষ হবে যদি তুমি শেষ করতে চাও। এবং সেটা আমাকে ঘিরে, আমাকে গ্রহণ করে তোমাকে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে হবে। আর সব নারীকে তুচ্ছ করে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে। যদি তোমার মনে এই সাহস থাকে তাহলে অচিরেই সব ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটবে। কাশিদা আসছে, ব্যাপারটা সহজ নয়। তোমরা তাকে চেনো না, আমি চিনি। সে এক হাতে মঙ্গল– অন্য হাতে দুর্ঘটনা নিয়ে চলাফেরা করে। তুমি কাশিদার সামনে এমন ব্যবহার কোরো না যাতে আমার ভালোবাসার অপমান হয়।

কাশিদা আসছে দুর্ভাগ্য নিয়ে। তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আমার জানা মতে কোনো পুরুষ মানুষেরই নেই। এবং কাশিদা আসছে, তোমার জন্য। এখন তোমার ওপর নির্ভর করছে আমার ভাগ্যে কী আছে। মনে রেখো সে আসছে কেড়ে নিতে। প্রেম-ভালোবাসা সব কিছু তার এক ফুঁৎকারে ফুঁপিয়ে মরে যায়। সে বহু নারী-পুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করেছে। তবে এবার আমি তাকে প্রতিরোধ করবই।

এখন কাশিদা না আসা পর্যন্ত মুনীরার ঘরে এক ধরনের ভীতবিহ্বল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টা লক্ষ করে মুনীরাকে বললাম,

–এ বাসায় মনে হচ্ছে এক বাঘিনী আসবে। তার ভয়ে সবাই অস্থির।

–দেখো কবি তুমি জানে না, এই বাসায় যে বাঘিনী আসছে সে আসলে কতটা হিংস্র। আর তার লক্ষ্য হলো আমার মনে হয় একমাত্র তুমি। তোমাকে দেখতে চায়। ভালো লাগলে গিলে খাবে– আর ভালো না লাগলে অতিশয় তুচ্ছ করে ফেলে দেবে। এই হলো ব্যাপার। এখন তুমি হলে কেন্দ্রবিন্দু। আমি হেসে বললাম,

–ও তোমরা ভাবছ আমি ন্যাকা সেজে বসে থাকব। আমি তোমাদের কাশিদাকে ভালো লাগলে তো ভালোই, কিন্তু যদি ভালো না লাগে তবে আমি তার সাথে এমন ব্যবহার করব যে, সে শুধু ফোঁস ফোঁস করবে– কিন্তু আমার ওপর ছোবল হানতে পারবে না।

এ কথায় মুনীরা চুপ মেরে গেল। মুনীরা শুধু মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখতে লাগল। তার দৃষ্টি লোভাতুর। আমি জানি এই মেয়েটি আমাকে আন্তরিকভাবে কামনা করছে। কিন্তু নানা বিবেচনায় আমি এখন আর মুনীরার দিকে ফিরে তাকানোর অবস্থায় নেই। আমি শুধু বললাম,

–আগে তো কাশিদা আসুক। দেখি তার মতলবটা কী, কী চায় সে। কেন আসবে। এসব যদি আশানুরূপভাবে শুভ সম্ভাবনায় ভরপুর থাকে– তাহলে খুবই ভালো। তা না হলে কাশিদা যে-ই হোক একটা মেয়েমানুষ ছাড়া তো আর কিছু নয়।

–আমি তোমার এ কথার প্রতিবাদ না করে পারছি না, এই 'মেয়েমানুষ' শব্দটা খুবই অপমানজনক। অথচ তোমরা দশটা পুরুষও কাশিদার মতো মেয়েকে আয়ত্তে রাখতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।

–আমি সেটা চাইও না।

আমার কথায় মুনীরা খুব খুশি হলো।

–তোমার আর অন্য দিকে তাকানোর সুযোগ নেই কবি। তবে এখন কেবল

অপেক্ষার মুহূর্ত গোনা, শুধু তোমাদেরই যে কাশিদার সম্বন্ধে কৌতূহল আছে– এমন নয়। আমারও আছে। কারণ এক সময় আমরা একসাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে হৈহুল্লোড় করে বেড়াতাম, সেই দিনগুলো আমার এখনো মনে পড়ে। জানি না, কাশিদার তা মনে আছে কি না। কী শয়তান মেয়ে ছিল কাশিদা! ছেলেদের জব্দ করতে কত কুবুদ্ধি তার মাথায় থাকত। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কী যেন ভেবে মুনীরার দিকে মুখটা এগিয়ে নিয়ে আমি হেসে ফেললাম। মুনীরা সহসা বলে ফেলল,

–বেকুবের তিন হাসি।

–এ কথায় আমি আবারো হেসে ফেললাম।

–যথার্থ বলেছ, কিন্তু বুদ্ধিমতি! তোমার জন্য আমাকে একটি গৃহ রচনা করতে হবে। মাথার ভেতর এখনই গৃহ ঢুকে পড়েছে। যদি কষ্টকর মনে হয় তাহলে এখনি ইচ্ছাটা ত্যাগ করতে পারো।

–দেখো তুমি কি মনে করো ইচ্ছা করলেই আমি প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসতে পারি। না– পারি না। আমার যেটা ভয় হচ্ছে সেটা হলো যদি কাশিদা বানুকে দেখে আমার ভালো লেগে যায় তাহলে আমি কিন্তু এ কথা তাকে জানাব। তোমার সামনেই জানাব।

–সে যদি তোমাকে হাত ঘুরিয়ে গালে একটা থাপ্পড় মারে তাহলেও কিন্তু তোমার বিষয়টা তুমি জানিয়ে দিও।

–দেখো ঠাট্টা কোরো না।

আমার কথায় হেসে ফেলল মুনীরা।

মুনীরার হাসির একটা অর্থ আমি আন্দাজ করতে পারলাম। মুনীরা ভয় পায় সুগন্ধিকে একই রকম। কারণ যে যা-ই বলুক, সুগন্ধি আকর্ষণীয় নারী। তার বুদ্ধিসুদ্ধিও মন্দ নয়, তবে তার চাহিদার বিষয়টা সে গোপন করার কৌশল জানে না। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত মুনীরার বর্তমান পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করলাম। ভাবলাম আমার এখানে অবস্থান করা উচিত হবে কি না। যদিও অসুখের ছুতোয় আমি এখানে পড়ে থাকতে পারি। কিন্তু মুনীরা সেটা কিভাবে নেবে কে জানে।

আমি একবার আমার আত্মসম্মানবোধের কথা বিবেচনা করে ভাবলাম– আমার এখনই নিজের আস্তানায় ফিরে যাওয়া উচিত। পূর্বাপর চিন্তা না করেই এমন ভাবনার উদয় হওয়াতে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল–

–আমার এখন চলে যাওয়াই উচিত। তা ছাড়া আজই কাশিদা বানু এসে উপস্থিত হলে কী ঘটবে তা আগে থেকে আন্দাজ করা যাচ্ছে না।

মুনীরা খুব নিচু স্বরে বলল-
-পুরুষ অর্থই কাপুরুষ।
আমি চিৎকার করে প্রতিবাদ করলাম।
-খবরদার! এ ধরনের কথা আমার সামনে আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করবে না।
-করলে কী করবে?
-তোমাকে ফেলে চলে যাবো। আর দ্বিতীয়বার তোমার চেহারা দেখব না।
-বুঝেছি তোমার বুকে জ্বালা আছে, আমি খুঁজে বের করব জ্বালাটা কিসের। এখন কথা হলো- প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো কাশিদা মাগিটা আসছে, আর আসছে এখানে। তার সাথে আমার মনে হয় হিসাব করে চলা উচিত।
-তুমি যদি কিছু না বলতে চাও, তাহলে আমিই বরং তার সাথে দু-চারটে কথা বলব। তুমিও শুনবে। সে কী চায়, কেন নিজেকে এত দিন আড়াল রেখে রহস্য সৃষ্টি করতে চেয়েছে, এসব প্রশ্ন আমি করব না। শুধু জানতে চাইব সে কী চায়। যদি তার উত্তর পাগলামিতে পূর্ণ না হয় তাহলে তাকে যথার্থ সম্মান আমরা দেবো। আসলে তো সবই একটা হেঁয়ালি। একটা মেয়ে আত্মগোপন করে থেকে নানা জায়গায় টেলিফোন করে তাকে খুঁজে বের করতে বলছে- এটার মধ্যে কোনো রহস্য আমি দেখতে পাই না। যার ইচ্ছা সে খুঁজবে। আমাদের অতো আগ্রহ নেই- আর আগ্রহ নেই বলেই আমার বিশ্বাস কাশিদা ধরা দিতে আসছে।
এ কথা বলার সাথে সাথেই বাইরের দরজায় শব্দ হলো। মুনীরা দ্রুত পাশের ঘরে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। মনে হলো বহু দিনের পুরনো বান্ধবীকে দেখে তার মনে খুশি উপচে পড়ছে। আমি পাশের ঘরে নিঃশব্দে সব কিছু শুনছি। কাশিদার কণ্ঠস্বর বেশ মিষ্টি। মিহি গলায় সে বলছে-
-তুই কেমন আছিস, আমাকে খুলে বল। আর আছিস এমন আবহাওয়ার মধ্যে মনে হয় এখানে আনন্দ ফেটে পড়ছে।
-দেখ আমরা তো ভালোই আছি। আমরা কোনো রহস্য সৃষ্টি করি না। কেউ হাত বাড়ালে আমাদের খুঁজে পায়। কিন্তু অসুবিধা হলো তোকে নিয়ে। সত্যি করে বল তো তুই কেমন আছিস?
-না, ভালো নেইরে, নিজেকে নিয়ে হয়রান।
-এখনো বিয়ে করিসনি কেন? তোর তো অনেক পুরুষ বন্ধু ছিল।
-মায়ায় পড়ে করিনি। কাকে ছেড়ে কাকে করব।

বলেই খিলখিল করে হেসে ফেলল কাশিদা।
মুনীরা সহসা বান্ধবীকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেলো। সেই পুরনো দিনের মতো।
—এখনো চেহারাটা মায়ায় ভরা।
—তাই বুঝি! পুরনো স্মৃতি ঘাঁটবি না— ঘাঁটবি না মুনীরা। তাহলে আমি কিন্তু কেঁদে ফেলব। আমাকে যতই পাষণ্ড ভাবিস আমি কিন্তু এখনো কাঁদতে ভুলে যাইনি। জানিস তো আমার কেউ নেই। কেউ যাদের থাকে না সেই মেয়েরা কিভাবে বড় হয় সেটা কি তুই জানিস? বড় দুঃখে-কষ্টে লাঠি-ঝাঁটা খেয়ে তারা মানুষ হয়। আমি সেভাবেই বড় হয়েছি, কাউকে ঠিকমতো ভালোবাসতেও পারি না। খালি সন্দেহ জাগে। ফেলে পালাবে। এ ধরনের মেয়ের কপালে দুঃখ ছাড়া কী আছে বল!
কথাগুলো এমনভাবে বলল, মুনীরা একেবারে হতবাক হয়ে কাশিদা অশ্রুসজল মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আর ঠিক আমার মনে হলো এই মেয়েটি যতই রহস্যে ঘেরা হোক প্রকৃতপক্ষে সহজ প্রকৃতির। এক সময় আমি এ ধরনের মেয়েদের মনে মনে কামনা করতাম। ঠিক এ সময় আমার কামরায় এসে ঢুকল দুই সখী। মুনীরা ও কাশিদা। এখন সহজ সম্ভাষণ জানিয়ে মুনীরা বলল,
—এই তো আমাদের কবি, তুই দেখতে চেয়েছিলি।
এ কথায় কাশিদা একটু লজ্জা পেলো বলে মনে হলো। যদিও আমার দিকে সালাম তুলতে তুলতে হাসল,
—আপনার অনেক কবিতা এক সময় আমার মুখস্থ ছিল।
—এই নাও কবি, এর নামই কাশিদা বানু। কোনো রহস্য নেই। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সুন্দরীও বলা যায়। আমার সহপাঠিনী-সখী, একে নিয়ে আর ধূম্রজাল সৃষ্টি করে লাভ নেই।
আমি কাশিদার দিকে তাকালাম। নাকের পাশে একটা তিল চিহ্ন আছে। ফর্সা মুখাবয়ব। টান করে খোঁপা বাঁধা। গোলগাল হাত-কব্জি এবং সুঠাম। প্রথম দৃষ্টিতেই পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো নারী। আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—
—তোমাকে কিন্তু আমরা বেশ হিংস্র প্রাণী বলে বিবেচনা করেছি।
—কেন বলুন তো! আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করিনি। শুধু নিজকে লুকিয়েছিলাম। যদি বলেন কেন, তবে বলব অকারণে লুকিয়ে ছিলাম। দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম, সব নারীই একজন পুরুষ চায়, আমিও তাই,

তবে বাছাই করা পুরুষ। তেমন মানুষ এখনো আমার ভাগ্যে জোটেনি। যদি জোটে তাহলে তার পায়েই লুটিয়ে পড়ব। আমার লজ্জা বলে কিছু নেই, আমি নারী আমার একজন পুরুষ চাই। পুরুষের ভালোবাসা ছাড়া কোনো নারী বেশি দিন বাঁচে না। এসব কথা বলতে আমার কোনো লজ্জা নেই। এখন আপনাদের মধ্যে এসে পড়েছি। আমার কীর্তির জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিন।

মুনীরা বলল–

–ঠিক আছে, আর কথা নয়। আমার ঘরে আয় আমি তোর বিশ্রামের ব্যবস্থা করছি।

আমি কিন্তু মেয়েটাকে দেখে দারুণভাবে অভিভূত হয়ে গেছি। কী যেন একটা মায়া-মুগ্ধতা ছড়িয়ে আছে কাশিদার চেহারায়। আমি তার সর্বাঙ্গ চকিতে ভালো করে দেখেছি। আর দশটা মেয়ের মতো নয় কাশিদা বানু। কেন নয়, সেটা আমি ধরতে পারছিলাম না। শুধু মনে হলো এ একটু আলাদা। যা হোক আমি নিজকে সংবরণ করে চলব বলে স্থির করলাম। গায়ে পড়ে কাশিদার সাথে সম্পর্ক গড়তে আমি অনিচ্ছুক ছিলাম। এখন এই অনিচ্ছায় একটু একটু করে অকারণ রাগে পরিণত হচ্ছিল। যেমন কোনো মেয়েকে অপছন্দ হলে অকারণে রেগে যাই। আমার তেমনি অবস্থা হলো। আমি একটু সরে থাকার চেষ্টা করব বলে ভাবছিলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আবার কাশিদা ও মুনীরা বিশ্রাম ফেলে আমার কাছে এসে হাজির হলো।

–এই যে কবি, আমার বান্ধবী তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চায়। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

–আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো!

সাক্ষাতে এটাই কাশিদার প্রথম প্রশ্ন।

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

আপনি জবাব না দিলেও আপনার সাথে আগে আমার কোথাও জানাশোনা হয়েছিল। আপনার কিছু অভ্যাসের কথাও আমার মনে আছে– আপনি মাগুড় মাছ খেতে ভালোবাসেন– গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরমে দহি-বড়া খেতে ভালোবাসেন। ঠিক বলিনি? এখন বলুন তো কোথায় আপনার সাথে পরিচয় হয়েছিল। এসব তো আর এক দিনে জানা হয় না। নিশ্চয়ই আমরা একসাথে অনেক দিন ছিলাম। কোথায় ছিলাম বলুন তো! সমানে কথা বলছে কাশিদা বানু। আমি নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলাম মাত্র। সে আবার বলল–

–মনে হলো, সেটা ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়। আমার বয়স তখন দশ-বারো হবে। চঞ্চল কিশোরী ছিলাম। কিন্তু আপনার মুখটা এখনো মনে আছে। আপনাকে সবাই কবি বলত– সেটাও মনে আছে।

আমি দেখলাম– আমি ধরা পড়ে যাচ্ছি। কে এই কাশিদা বানু। আমার চেয়েও আমার সম্বন্ধে বেশি জানে। কেন জানে? আমি তার সাথে অস্বাভাবিক ব্যবহার করব বলে মনস্থির করে ফেললাম। কিন্তু তার চঞ্চল কৌতূহলী চোখ দু'টি আমাকে ছিদ্র করে ফেলতে লাগল। শুধু দেখছে– শুধু দেখছে। দেখে আশা মিটছে না। আমি লক্ষ করলাম কাশিদার ব্যবহার ও কথাবার্তায় মুনীরা একটু বিব্রতকর অবস্থায় আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার যে এই কাশিদা বানুদের সাথে একটা অতীত আছে এটা বুঝতে পেরে মুনীরা স্তম্ভিত হলেও কথা বলার কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না। কিন্তু আমার

মুখোমুখি এসে বসেছে কাশিদা বানু। যেন এক অজগর-অজগরী আমাকে গিলে ফেলার আয়োজন করছে। আমি চুপ করে কাশিদাকে দেখছি। চোখাচোখি হলে চোখ সরিয়ে নিচ্ছি। যদিও কোথায় লজ্জাটা লুকিয়ে আছে তা আমরা কেউ জানতাম না।

মুনীরা হেসে বলল–

–দেখিস, আমাদের কবিকে গিলে ফেলিস না যেন।

আচমকা কথাটা শুনে কাশিদা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মুনীরাকে দেখল।

–তোদের কবি? এ কথাটা বলবি না। কেন বলছি তুই কবিকেই জিজ্ঞেস কর। যা হোক রহস্য রেখে লাভ নেই। তোর চেয়ে অনেক বেশি আমি কবিকে জানি। আমরা বহু দিন পাশের দেশে পরবাসী হয়ে এক বাড়িতে ছিলাম। অনেক বেশি জানিরে আমি। আমি কবির অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ। আজ অবশ্য সে দাবি করার মতো সাহস আমার নেই। আমার দোষেই আমি সব হারিয়েছি। এখন আর আফসোস করে লাভ নেই।

বলেই কাশিদা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। তার দেহ থেকে ফোঁফানীর মতো একটা শব্দ বেরোতে লাগল। কাশিদা কাঁদছে। আমি এক মহা বিব্রতকর অবস্থায় সেখান থেকে পালানোর পথ খুঁজছিলাম। এ সময় মোবাইল ফোনটা বেজে উঠতেই আমি সুগন্ধির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

–কী ব্যাপার। নিজের আস্তানায় ফেরার দরকার বোধ করলা! কী করছ?

–পালানোর পথ খুঁজছি।

আমার কণ্ঠ শুনে সুগন্ধি একটু বিস্মিত হলো বলে বোধ হয়। আমি বললাম–

–তুমি কি জানো– বহু দিন আগের হারিয়ে যাওয়া এক সখীকে আমি ফেরত পেয়েছি। এখন সে আমার সামনে। সম্পর্কের দাবি তুললে কেউ তার সাথে পেরে উঠবে না। বহু দিন আগে হারিয়ে যাওয়া অনেক জীবন কাহিনী আবার আমার কাছে ফিরে এসেছে। আমি এসব থেকে পালাতে পারব না, আর পালাতে চাইও না। এখন সব কিছু স্থির হবে নতুনভাবে। ভালোবাসাবাসিটা কোনো খেলা নয়, এর একটা দৃঢ় ভিত্তি থাকতে হবে। কাশিদার সাথে দেখা হওয়ায় এসব কথা সে মনে করিয়ে দিয়েছে। সব কাহিনী সত্য। সত্য থেকে পালাব কেন? এতে যদি আমার আজ অনেক ক্ষতি হয়, অনেকের সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় তাহলে কী করব বোন? কাশিদা যে আমার এত কাছের এমন আত্মীয় তা তো আমি চিন্তাও করিনি। এক নিঃশ্বাসে মোবাইলে আমি কথাগুলো বলে গেলাম। মনে হলো ও পাশ

থেকে কেউ তার সেটটা বন্ধ করে বুকে চেপে ধরেছে। বুকের ধুপ-পুকানি যন্ত্রের ভেতর দিয়ে ত্বরান্বিত হয়ে মনে হলো আমার ভেতরে একটু একটু করে ঢুকে যাচ্ছে। যদিও আমি সুগন্ধিকে আচমকা আমার মনোভাব ব্যক্ত করে ফেলেছি– আমার মনে হলো সুগন্ধি এজন্য যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল। সুগন্ধি অনেক দুঃখ পেয়ে এত দূর পর্যন্ত এসেছে। তার হজম করার শক্তি মনে হয় আমার চেয়েও বেশি। সুগন্ধি আবার কল করল। আমি মোবাইল কানে তুলতেই একটা বিমর্ষ হাসির শব্দ শুনতে পেলাম। সন্দেহ নেই সুগন্ধি এখনো হাসার চেষ্টা করছে।

–তুমি হাসছো!

–দুনিয়াটা এত বেঈমানে ভর্তি ভেবে এখন দুঃখের বদলে হাসি পায় আমার। আমি জানতাম না যে, কবিরাও এ রকম হয়। যা হোক কবি তোমাকে বলছি– আমি কারো ওপর বেশি আশা করিনি। আশা ভঙ্গের বেদনাও আমাকে ভুগতে হবে না। তবু তোমাকে জানাই আমি তো একটা মেয়ে। আমি নারীত্বের অপমান সইব না। তুমি আমাকে আশা দিয়েছিলে। আশ্রয়ও দিয়েছ। কিন্তু ভালোবাসা দাওনি। কে কাশিদা বানু তা আমি জানি না। আমি শুধু জানি, সে আমার কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিতে এসেছে। ভেবো না, আমি তাকে ছেড়ে দেবো। আমি তাকে ন্যাংটা করে ফেলব। তার সব আবরণ টেনে খুলে ফেলব। আমি ছাড়ব কেন? আমার যদি সব যায় তাহলে কাউকে কিছু পেতে দেবো না। মনে রেখো আমি সেই সুগন্ধি। যাকে অপদস্থ করার জন্য সবাই চেষ্টা করেছে, আমার অপমান আমি নিঃশব্দে হজম করেছি।

–দেখো, অধৈর্য হয়ো না। আন্দাজে কাউকে এখনি শত্রু ভেবো না। আমি তোমাকে চেয়েছি এটা তো ঠিক, কিন্তু কাশিদা বিপর্যয় নিয়ে এসেছে– এর স্বরূপটা কী তা তুমি বুঝতে পারবে না। সে যে এত আপনজন–এত নিকটাত্মীয় আমি তো তা অস্বীকার করতে পারি না। এখন সব কিছুই নির্ধারিত হবে নতুন নিয়মে। এতে যদি তোমার সাথে আমার সম্পর্ক বদলে দিতে হয় তাহলে আমাকে তো তোমাকে ক্ষমা করতেই হবে।

সাথে সাথে মোবাইলে চিৎকারের শব্দ ভেসে এলো।

–বেঈমান! বদমাশ কোথাকার! তুমি কবি না ছাই।

আমার কানে সুগন্ধির অগ্নিঝরা অভিশাপ আর্তনাদের মতো বেজে উঠল। আমি সেটটা অভ্যাসের বশে কানেই চেপে ধরে রাখলাম। সুগন্ধি কাঁদছে। তার ফোঁফানির শব্দ মোবাইলের ভয়েসে ভেসে আসতে লাগল।

মুনীরার ভেতরের একটি ঘরে কাশিদাকে টানতে টানতে নিয়ে এলো মুনীরা।
–আমাকে টেনে এ ঘরে আনলি কেন?
–তুই বেশি কথা বলিস। যখন রহস্য নিয়ে লুকিয়ে ছিলি তখন কী করতি! এ রকম বকবক করে কথা বলার লোক কোথায় পেয়েছিলি! যা হোক তোকে একটা সৎ পরামর্শ দেই, সেটা হলো অনেকেই অনেক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এখানে। আমিও আছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তুই এসে সব গড়বড় করে দিলি। আমি বলি কী–তুই তোকে গুটিয়ে নে। তা না হলে তোকে সবাই এখানে অভিশাপ দেবে।
মুখ ঘুরিয়ে কাশিদা হাসল।
–আমাকে কেউ মেরে ফেলবে না তো?
মুনীরা হাসল। সেটাও বিচিত্র নয়।
–জানিস তো, সুগন্ধির আঁতে ঘা পড়েছে। সে কাউকে সহজে রেহাই দেবে না। আমি বুঝি না মানুষ বিয়ে করে কেন, বিয়ে কি কোনো নিরাপত্তা? সবাই ভাবে বিয়েই নিরাপত্তা। একজনকে চিরকালের জন্য বেঁধে ফেলেছি– হায়রে বাঁধন কত ঠুনকো।
এতক্ষণ এই ঘরে অবস্থান করে আমার ধারণা হলো– আর এখানে থাকা কিছুতেই উচিত নয় আমার। অসুস্থ নড়বড়ে শরীর নিয়েই আমি বেরিয়ে

পড়ব স্থির করলাম। আমি অনুচ্চ কণ্ঠে মুনীরাকে ডাক দিতেই সে কাশিদাকে অন্য ঘরে রেখে দৌড়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

– কী ব্যাপার!

–আমি আর এখানে থাকব না।

– কিন্তু তুমি তো অসুস্থ! কোথাও যাওয়ার মতো শক্তি আছে কি?

–আমি চেষ্টা করে দেখি।

–দেখো, আমি কিন্তু তোমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছি না, তুমি নিজেই চলে যেতে চাচ্ছো। জানি কোথায় যেতে চাও। যাও, আমি বাধা দেবো না। তাহলে আমি কাশিদাকে একটু দেখি। সে কিন্তু কারো কোনো ক্ষতি করার জন্য আসেনি। এখানে সবাই নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত। অথচ এখানে আমরা দায়ী করছি কাশিদাকে। কারণ সে স্বাভাবিকতার বিপরীতে কাজ করেছে– কিন্তু কারো ক্ষতি তো করেনি!

এ কথায় আমি চিৎকার করে প্রতিবাদ করলাম।

–নিশ্চয়ই করেছে। সে-ই ক্ষতিটা শুরু করেছে। আর দুর্ভোগ পোহাচ্ছে সবাই। এর খেসারত তাকেই দিতে হবে। সে কেন লুকিয়ে থেকে বলল, আমাকে বের করো। এ ধরনের কথা কোনো নারী বললে অবশ্যই সব পুরুষ তাকে খুঁজে বের করতে সচেষ্ট হবে। সবার ভাগ্যলিপিতে লেখা থাকবে একটি করে দুর্ঘটনা। এ ধরনের নারীকে সমাজ দুর্ভাগ্য মনে করে। আমি আর এই হেঁয়ালির পেছনে ছুটব না। আমি তাকে সম্পূর্ণ মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করব। আমি তাকে খুঁজব না। আমি তাকে দুষবও না। আমি তাকে চাইবও না।

মুনীরা খিলখিল করে হেসে ফেলল।

–তোমার কথা থেকেই মনে হচ্ছে– তুমি তা পারবে না। কারণ তোমার পুরো মন আসলে এই কাশিদা বিবি হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছে। তুমি ইচ্ছা করলেই আর বেরোতে পারছ কই?

–যদি আমি বেরোতে না পারি তাহলে আমি সব কিছু নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবো। কারণ আমার অব্যাহতি দরকার– রেহাই চাই আমি। আবার কবিতা লিখতে চাই। স্বপ্ন দেখতে চাই। এ কাশিদা বানু আসলে কী? দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

ঠিক এ সময় অন্য ঘর থেকে কাশিদা বানু এসে হাজির হলো আমাদের মাঝে।

–ঝগড়া করছেন। আমাকে নিয়ে? আমি কিন্তু কারো কোনো অনিষ্ট করতে বা সম্পর্ক নষ্ট করতে আসিনি। আমি একটু আশ্রয়ের জন্য এসেছি। কারণ

আমি নিরাশ্রয়। আমি একটু স্নেহ-মমতার ভিখারি। কারণ আমি অতীত প্রত্যুষে আমার পিতা-মাতাকে হারিয়েছি। কেউ নেই আমার। আমি ভালোবাসার কাঙাল। আমাকে একটু আশ্রয় দিন।

এ কথায় এমন কান্নার ব্যাকুলতা ঝরে পড়ল –যাতে আমরা স্তব্ধ হয়ে গেলাম। আমার বুকের বাঁ পাশটা ব্যথা করে উঠল। মুখে হাসি রেখে আমি মুনীরার দিকে মুখটা এগিয়ে গিয়ে বললাম–

–এই মহিলা, আমাদের জন্য বিপর্যয় বা দুর্ঘটনা ডেকে আনতে চায়। আসলে এ ছাড়া তো আর কিছু করারও নেই। সে নিজে দোষী না হলেও নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কথা হলো যে, আমরা তাকে চাই কি না। অন্তত আমি তো চাই না।

আমার কথায় কাশিদা আমার দিকে একবার তাকালো। কিন্তু সাথে সাথে চোখ নামিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলো। আমি দেখলাম তার বিশাল দু'টি চোখ থেকে গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আমার খুব মায়া হলো। হঠাৎ মনে হলো– লুকিয়ে থাকার যে রহস্য এখন তার খেসারত দিতে হবে এই মেয়েটিকে। আমি অত্যন্ত মৃদু শব্দে বললাম,

– তুমি ইচ্ছা করলে এই খাটটাতে বসতেও পারো।

মেয়েটি হাতের ইশারায় না করল। এবং খুব মৃদু শব্দে আমাকে বলল

–আমি কাঠগড়ার আসামি। দণ্ড পেতে অপেক্ষা করছি। আমার বসলে চলে না।

আমি দেখলাম– মেয়েটির মধ্যে যে হিংস্রতার কথা শুনেছিলাম বাস্তবে তার কোনো কিছুই নেই। আমি অনেকক্ষণ পর্যন্ত কাশিদাকে ভালো করে দেখলাম। ফর্সা-গোলগাল চেহারা, নাকটা উঁচু এবং তীক্ষ্ণ। চোখ দু'টি মায়াভরা। মনে হয় কাজল টেনে রেখেছে। চুল শুকনো লালচে ধরনের– পেছনে একটা বেণী বাঁধা। গলায় একটা সরু সোনার হার কণ্ঠের ওপর চিক্‌চিক্ করছে। দেখলেই মনে হয় বেশ বাঁধনের মেয়ে। আমি আবার ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ঘোরালাম।

– কেন, মিছে রহস্য সৃষ্টি করেছিলে– বলো তো!

–আমি মেয়ে বলেই করেছিলাম। আমি জানি পুরুষগুলোর অভ্যাস হলো শুধু সুযোগ শুঁকে বেড়ানো। আমি এ ধরনের পুরুষদের নাকে দড়ি লাগিয়ে একটু খেলতে পছন্দ করেছিলাম।

–তাহলে এখন কী দেখছ?

–নিজেই ফেঁসে পড়েছি। তবে আমি সব ধ্বংস করে দেবো। আমাকে

ঘাঁটাতে এলে আমিও দেখে নেবো।
–তুমি কী চাও?
আমার কথায় একেবারে চমকে গেল কাশিদা বানু। মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখছে।
–তুমি যদি কিছু না চাও, তাহলে তোমাকে কেউ চাইতে পারে, এখানে বাধা কোথায়?
– আমাকে কেউ চায় না।
–একেবারেই মিথ্যা কথা। আমি জানি তোমাকে কেউ চায়। তুমি তার কাছে আত্মসমর্পণ করো। সে তোমাকে সব কিছু পূর্ণ করে দেবে। ভালোবাসতে শেখো না কেন। মেয়ে হয়ে জন্মেছ– ভালো তো বাসতে হবে।
আমার কথায় কাশিদা একেবারে বিলাপ করে কাঁদতে থাকল। যেন একটা ছোট শিশু। আমি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য হেসে ফেললাম।
– তোমার কান্নাটা ভারি সুন্দর। তা ছাড়া তুমি সুন্দরী মেয়েও বটে।
–আমার সাথে ঠাট্টা করছেন?
– ঠাট্টা করব কেন? তোমার প্রাপ্যটা তোমাকে দিয়েছি শুধু।
–আমি সবার সাথে মিশতে চাই। সবার সাথে মিলেমিশে বাস করতে চাই।
–থামো। এসব করতে হলে তোমাকে প্রেম কী তা শিখতে হবে। তুমি একটা মেয়ে ছাড়া তো কিছু নও। এই সুবিধাটুকু নিয়ে কাউকে হাসির পাত্রে পরিণত করা ছেড়ে দাও। আমার মনে হয় তোমার অনুতাপ শুরু হয়েছে। এ জন্যই তুমি এখানে এসেছ। তবে তোমার সখীটিও যেন একই ধাঁচের মেয়ে।
আমার কথায় মুনীরা এবার ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখল।
–আমার ওপর রাগ করে লাভ নেই। আমি কবি, সত্য বলি, স্বপ্নের ব্যাখ্যা করি। বঞ্চিতের বুকে হাত বুলাই। আমি পারতপক্ষে কাউকে শূন্যহাতে ফিরে যেতে বলি না।
আমার কথায় মুনীরা মুখ খোলে,
–তুমি থামো তো, তুমি দেখতে পাচ্ছো না একটি মেয়ে ভেতর থেকে ভেঙে যাচ্ছে।
আমার কথায় কাশিদার কান্না আরো একটু স্পষ্ট হয়ে উঠল।
–আমি তাহলে যাই।
–না এই মুহূর্তে তোমার যাওয়া চলবে না। একটা মীমাংসা দরকার। ঘটনা

হলো এই মেয়েটি আমার বান্ধবী– কাশিদা বানু। রহস্যের সৃষ্টি করতে গিয়ে রহস্যময়ী হয়ে এখন একেবারে অসহায় অবস্থায় পড়ে গেছে। কিন্তু তার প্রতিভা আছে– রূপ-গুণ আছে কিন্তু মানবিক বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত কম। এখন তাকে বিপদ থেকে বাঁচতে হলে একজনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আর আত্মসমর্পণ করতে হবে কি না একজন উদাসীন কবির কাছে?
কথাটা বলে উচ্চহাস্য করল মুনীরা। আমি দেখলাম অযথা কাশিদাকে খাটিয়ে লাভ নেই, কারণ সে পরাজিত হয়ে ধরা দিতে এখানে এসেছে। এখন অপমান তার প্রাপ্য নয়। আমি নিজেই এগিয়ে গেলাম কাশিদার দিকে।
–আমি এই মেয়েটিকে তার কিশোরকাল থেকে চিনি। এই চেনার পেছনে আছে অনেক ঘটনা, অনেক সম্পর্কের জড়াজড়ি। কিন্তু সব কিছুর উপরে হলো আমি এক সময় একে ভালোবাসতাম। সেই দাবি এখন উত্থাপন করতে চাই।
আমার কথা শেষ হওয়ার আগে কাশিদা বানু আমার বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং চিৎকার করে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল। আমি তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বুকের ওপর অনেকক্ষণ জড়িয়ে ধরে রাখলাম। পিঠের ওপর হাত বুলিয়ে দিলাম। একটু ঠাণ্ডা হলে বললাম
–চলো ঘরে ফিরে যাই, একদা আমাদের তো একটা ঘর ছিল, বাড়ি ছিল। বলো, ছিল না?
–এখনো আছে, এই বুকের ভেতরে। লজ্জা-শরম ত্যাগ করে চলো আমরা ঘরে ফিরে যাই।
আমি আচমকা বলে ফেললাম।
–চলো।